জুলাই বিপ্লব, সেক্যুলার রাজনীতি এবং মুসলিম রাজনৈতিক কর্তাসত্ত্বা

মাহমুদুর রহমান

[৩১শে আগস্ট ২০২৪ সালে Ummatics আয়োজিত “**Bangladesh’s Revolution: Challenges, Opportunities and the Umma**” ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক ছিলেন জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী উপদেষ্টা এবং আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান এবং ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গের এনথ্রোপলজি বিভাগের ভিজিটিং এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. তানজীন দোহা। তাঁদের বক্তব্যে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় আধিপত্যবাদ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংকট, একাত্তর, শাহবাগ, শাপলা, জুলাই বিপ্লব এবং মুসলিমদের রাজনৈতিক কর্তাসত্ত্বার বিভিন্ন দিক উঠে আসে। সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষিতে এসব বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদর জন্য এই আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ পেশ করা হল।]

মাহমুদুর রহমান

আমি শুরুতেই দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে চাই, এই অঞ্চলের ভূরাজনীতি বোঝার জন্য। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম অঞ্চল। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে চারটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ—পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ। দুটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ—ভারত ও নেপাল এবং দুটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ—শ্রীলঙ্কা ও ভুটান। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের প্রস্থানের পর থেকেই ভারত এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় ভারতের বিপরীতে সবচেয়ে বড় বাধা পাকিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে ভুটান ১৯৪৯ সালে বন্ধুত্ব চুক্তির মাধ্যমে ভারতের প্রভাবের অধীনে আসে। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত ক্লাসিক্যাল গ্রিক আধিপত্যবাদের মতো ভুটানের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভুটানের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। ভুটানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে ভারত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাকি ছয়টি দেশের মধ্যে, গত পনেরো বছরে ভারত বাংলাদেশে পুতুল সরকার বসিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে।

গত পনেরো বছরে বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের অধীনে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক গুম, আইনবহির্ভূত গ্রেফতার এবং কারাগারে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। অথচ, একসময় বাংলাদেশ ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত, বাংলাদেশ গণতন্ত্রের অল্প কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে একটি ছিল। এ সময়ে তিনটি স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দের দল ও নেতা নির্বাচন করতে পেরেছিল। ৯/১১ পরবর্তী বিশ্বে, প্রেসিডেন্ট বুশের “আমাদের সাথে অথবা আমাদের বিপক্ষে” নীতির ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই নীতির মাধ্যমে আমেরিকান প্রশাসন ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার অঘোষিত মোড়ল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকা ভারতকে চীন এবং “ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের” বিরুদ্ধে কৌশলগত মিত্র হিসেবে ঘোষণা করে। এই নীতির সুযোগ নিয়ে ভারত বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

২০১৯ সাল পর্যন্ত, ভারতের পুতুল সরকারের অধীনে বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলো নীরব ছিল। এর পেছনে কারণ ছিল, ভারত নিয়মিতভাবে পশ্চিমা রাজধানীগুলো, বিশেষত ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং ব্রাসেলসে তাদের ব্রিফিং প্রদান করত। ভারত তার পশ্চিমা মিত্রদের আশ্বস্ত করেছিল যে, ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং ইসলামপন্থার উত্থান নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাংলাদেশকে তাদের অনুগত রাষ্ট্র হিসেবে ধরে রাখা প্রয়োজন। এই অবস্থার কারণে বাংলাদেশকে চরমভাবে ভুগতে হয়েছে।

আগস্ট মাসের এই বিপ্লবের আগে মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াই করে গেছে। এই লড়াইয়ে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এক হাজারেরও বেশি মানুষকে জোরপূর্বক অপহরণের শিকার হতে হয়েছে, এবং অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। যখনই সরকার সংকটে পড়ত, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ক্ষমতা ব্যবহার করত। দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে পশ্চিমা দেশগুলোর রাজনীতি ও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষণ এটি যে, চীনকে মোকাবিলা করতে ভারতকে প্রয়োজন, তাই তারা বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদের বিষয়ে নীরব থেকেছে।

এই পরিস্থিতিতে, জুলাই ও আগস্ট মাসে টানা তিন থেকে চার সপ্তাহ ধরে যে অসাধারণ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল ১৯শে জুলাই আবু সাঈদের শাহাদাত। সেদিন ছাত্ররা পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছিল, এবং আবু সাঈদ সেই প্রতিবাদে সামিল ছিল। পুলিশের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে সে দুই হাত প্রসারিত করে তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। পুলিশ গুলি শুরু করলে, সে সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সে আবার উঠে দাঁড়ায়। পুনরায় গুলিবিদ্ধ হয় এবং আবার মাটিতে পড়ে যায়। দুইবার মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও সে আবার উঠে দাঁড়ায়, এই নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। তবে শেষ পর্যন্ত, সে শহীদ হয়। এটি অনেকটা ২০১০ সালের তিউনিসিয়ার বুআজিজির আত্মত্যাগের মতো, যা আরব বসন্তের সূচনা করেছিল। তবে আবু সাঈদের মৃত্যু ছিল আরও বেশি সাহসিকতাপূর্ণ। এটি কোনো আত্মহত্যা ছিল না, বরং সরকারের নৃশংস বাহিনীর সামনে এক নিরস্ত্র চ্যালেঞ্জ। আমি মনে করি, এই ছবি একবিংশ শতাব্দীর যে কোনো বিপ্লবের জন্য একটি আইকনিক প্রতীক হয়ে থাকবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য, আবু সাঈদ বিপ্লবের নতুন নায়ক।

এই বিপ্লব কি সফল হতে যাচ্ছে নাকি আরব বসন্তের মতো ব্যর্থ হবে সেটা বুঝার জন্য ভূরাজনীতির দিকে লক্ষ্য করতে হবে। পতিত স্বৈরাচার এখন ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন এবং ভারত এই ক্ষতিকে সহজভাবে মেনে নিবে না। হাসিনার পতন এই অঞ্চলের ইতিহাসে ভারতের বিদেশনীতির সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। শ্রীলংকাতেও নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে তামিল টাইগারদের কাছে পরাজিত হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিলো। নেপাল ক্ষুদ্র দেশ হয়েও ভারতীয় আধিপত্যবাদকে পরাজিত করেছে। আফগানিস্তানেও আশরাফ গণির পতনের পর আমেরিকানদের পাশাপাশি ভারতীয়দেরকেও আফগানিস্তান ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু ভারত বাংলাদেশে যেকোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি কৌশলগত বিনিয়োগ করেছে।

> বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় এজেন্টের উপস্থিতি বিদ্যমান। তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসার চেষ্টা করবে। কারণ, যদি বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয়, তাহলে ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশ এমন একটি মার্কেটপ্লেস, যেখানে ভারত পণ্য এবং জনশক্তি রপ্তানি করে বিপুল আয় করে থাকে। বাংলাদেশ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রেমিট্যান্স প্রদানকারী দেশ। বাংলাদেশের মতো ছোট দেশ ভারতকে এতো টাকা প্রদান করছে এটা অকল্পনীয়। তাই এটি ভারতীয় অর্থনীতির জন্য বিশাল ক্ষতি। এর চেয়েও বড় ক্ষতি হয়েছে ভারতীয় সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে তাদের কৌশলগত নীতির।

বাংলাদেশ সংলগ্ন চিকেন নেক ভারত, চীন ও বাংলাদেশকে সংযুক্ত করেছে যা খুবই সংকীর্ণ করিডোর। বিগত ফ্যাসিস্ট দরকার ভারতকে তথাকথিত ট্রানজিট দিয়েছে- যা মূলত করিডোর। এর মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের সুযোগ পেয়েছে। ক্ষমতায় থাকা বর্তমান সরকার যদি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় যানবাহনের চলাচল বন্ধ করতে হবে। ভবিষ্যতে যেকোনো চীনা আক্রমণে এটি ঝুঁকিপূর্ণ।

এই বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করছে যথাসময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের উপর। গত ফ্যাসিস্ট সরকার ভারতের সাথে এমনকিছু চুক্তি করেছে যা শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতির বিরুদ্ধেই নয় বরং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেও। আমি আশা করি, বর্তমান সরকার ভারতের সাথে হওয়া সব চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি বা স্বাধীন কমিশন গঠন করবে। এটি নির্ভর করছে ক্ষমতায় থাকা সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং রাজনৈতিক সক্ষমতার উপর। ভারতীয় আধিপত্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা তাদের আছে কিনা এবং পতিত সরকার ভারতের সাথে যে চুক্তি করেছে তা যদি

বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী হয়, তাহলে সরকার তা বাতিল করবে কিনা সেটা এই সরকারের জন্য বড় পরীক্ষা। এর উপর বর্তমান সরকারের সক্ষমতা ও সদিচ্ছা নির্ভর করছে।

আমার কাছে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া- সেটা আগামী এক বছরের মধ্যে হোক বা দুই বছরের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, ভারতের সাথে আমাদের সব চুক্তি পুনর্বিবেচনা করে, প্রয়োজনে সেগুলো বাতিল করা। অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য বিদ্যমান। অভ্যুত্থানের লক্ষ্য থাকে কেবল শাসকের পরিবর্তন আর বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে সিস্টেমের পরিবর্তন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি সফল অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এখন আমাদেরকে বিপ্লবের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হতে হবে। তবে এই বিপ্লবের পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন নেই, এবং অন্তর্বর্তী সরকারেরও কোনো রাজনৈতিক দর্শন নেই।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেক্যুলার রাজনৈতিক দর্শন বলে কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিদ্বেষী রাজনৈতিক দর্শন। যারা বাংলাদেশে সেক্যুলার পরিচয়ে পরিচিত, তারা মূলত ইসলামোফোবিক। এই সেক্যুলার রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁর মাধ্যমে, যা মূলত বৃটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের উন্নতির জন্য সহায়ক ছিল। এই বাঙালি রেনেসাঁ আসলে ছিল বাঙালি হিন্দু রেনেসাঁ, যেখানে মুসলমানরা ছিল সম্পূর্ণভাবে "অপর"। নিরোদ চৌধুরী □Autobiography of an Unknown Indian□ বইটিতে বেঙ্গল রেনেসাঁ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। আওয়ামী লীগ এবং তথাকথিত সেক্যুলারদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বয়ানও মূলত অষ্টাদশ শতকের বেঙ্গল রেনেসাঁ থেকে উদ্ভূত, যা ছিল বাঙালি হিন্দুদের রেনেসাঁ, যেখানে মুসলমানদের কোনো স্থান ছিল না।

এই বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে আমাদেরকে বাংলাদেশের মানুষের জন্য এবং ভারতের আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য নতুন বাঙ্গালী মুসলিম বয়ান তৈরি করতে হবে। আমি যখন ভারতীয় আধিপত্যবাদ নিয়ে কথা বলতাম, তখন প্রথমদিকে আমাকে চরমপন্থী আখ্যা দেয়া হতো। যদিও তারা সরাসরি আমাকে সন্ত্রাসী বলতো না। তাদের কাছে কেউ যখন চরমপন্থার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই সে সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হয়। তরুণরা এখন বুঝতে শুরু করেছে, ভারত আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। ভারত আমাদের প্রধান শত্রু এটা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারছে। তবে এই বিপ্লবে আমাদের সফল হতে হলে আমাদেরকে নতুন বয়ান তৈরি করতে হবে।

পশ্চিমারা ইসলামী দেশগুলোতে গণতন্ত্র চায় না। তারা সেখানে স্বৈরাচার চায়। ইসলামী দেশগুলোতে যদি উদার গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ইসলামিক শক্তিগুলোই শাসনক্ষমতায় বসবে। তাই আমেরিকাসহ অন্য পশ্চিমা দেশগুলো গণতন্ত্র প্রচার করলেও ইসলামি দেশে গণতন্ত্র চায় না। মিশর হলো এর একটি উদাহরণ। জাতিরাষ্ট্র এক ধরনের বাস্তবতা। যখন আমরা উম্মাহ নিয়ে কথা বলি, আমার প্রশ্ন হলো, গাযায় যা ঘটছে, সেখানে উম্মাহ কোথায়? গাযায় আমি কোনো উম্মাহ খুঁজে পাইনি। আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই ও বোনদের সাথে ওআইসি এবং আরব লীগ□এই দুই সংগঠনকেও গাযায় দাফন করা হয়েছে।

শাপলা:

সরকার শুধুমাত্র শাপলা গুম করার চেষ্টা করেনি বরং এই গণহত্যাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছে। শাপলা হচ্ছে রাসূল (সা) এর অবমাননার প্রতিবাদে মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলন। তথাকথিত সেক্যুলার মিডিয়ায় বহুদিন ধরেই রাসূল (সা)-কে অবমাননা করা হচ্ছিলো। ২০১৩ সালে লক্ষাধিক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এই অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবিতে ঢাকায় মার্চ করে। সরকার রাষ্ট্রীয় নিপীড়নমূলক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদেরকে দমন করে যেভাবে আগস্টের বিপ্লবকেও দমনের চেষ্টা করেছিলো। সেসময় সরকার □ইসলামি সন্ত্রাস□ কার্ড ব্যবহার করে এই আন্দোলন দমন করে। যদিও □ইসলামী সন্ত্রাস□ কার্ড বর্তমানে এতো প্রাসঙ্গিক না ঐ সময়ে যতটুকু প্রাসঙ্গিক ছিলো। পশ্চিমা বিশ্ব এবং ভারত তখন সরকারকে সমর্থন করে এবং ইসলামিস্টদের বিপক্ষে সরকারের গণহত্যাকে সমর্থন জানায়। কারণ তারা মনে করেছিলো ইসলামিস্টরা আন্দোলন করছে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য।

সরকার শুধু শাপলার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেনি, বরং এই গণহত্যাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শাপলা হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর অবমাননার প্রতিবাদে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। তথাকথিত সেক্যুলার মিডিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাসূল (সা.)-কে অবমাননা করা হচ্ছিল। ২০১৩ সালে, লক্ষাধিক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এই অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবিতে ঢাকায় সমাবেশ করে। সরকার তখন রাষ্ট্রীয় নিপীড়নমূলক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের দমন করে, ঠিক যেভাবে আগস্টের বিপ্লবকেও দমন করার চেষ্টা করেছিল। সেই সময়ে, সরকার □ইসলামী সন্ত্রাস□ কার্ড ব্যবহার করে এই আন্দোলনকে দমন করে। যদিও এখন এই

"ইসলামী সন্ত্রাস" কার্ড এতোটা প্রাসঙ্গিক নয় তবে তখন তা খুবই কার্যকর ছিল। পশ্চিমা বিশ্ব এবং ভারত তখন সরকারের পক্ষে দাঁড়ায় এবং ইসলামিস্টদের বিপক্ষে এই দমনমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন জানায়, কারণ তারা মনে করেছিল ইসলামিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করছে।

এখানে শ্রেণির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী গ্রামীণ পরিবেশ ও নিম্নবিত্ত সমাজের অংশ। সেই সময় শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তরা দরিদ্র মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সমর্থন করেনি, যেমনটা তারা এবারের বিপ্লবে করেছে। আমার মনে হয়, এ কারণেই এবারের অভ্যুত্থান সফল হয়েছে, আর ২০১৩ সালের আন্দোলন সফল হয়নি। ২০১৩ সালে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তরা মনে করেছিল, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দেশের "তালেবানাইজেশন" করতে চায়। তাই সরকার শাপলাকে সহজেই দমন করতে পেরেছিল। কিন্তু এবার সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান ও শহুরে মধ্যবিত্তরা নিজেরাই অংশগ্রহণ করায়, সরকার একই নীতি অনুসরণ করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলাম প্রশ্ন:

বাংলাদেশে ইসলামের বিষয়ে আমাদের আলোচনা ১৯৭১ বা ১৯৪৭ থেকে শুরু করা উচিত নয়; বরং তা বাংলার স্বাধীন সুলতানদের সময় থেকে শুরু করতে হবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা প্রথম বাংলাকে একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের আগে ভৌগোলিকভাবে বাংলার অস্তিত্ব থাকলেও কোনো রাজনৈতিক সত্তা ছিল না—বাংলা ছিল বিভক্ত, ৮-৯টি অংশে বিভাজিত। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম বাংলাকে একটি একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে একীভূত করেন এবং "সুলতান অব বাংলাহ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাই বাংলার রাজনৈতিক পরিচয় মূলত মুসলিমদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি রেনেসাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই, তাহলে আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্বাধীন বাংলা সালতানাত থেকে।

১৯৭১:

বাংলাদেশে ইসলামকে অবৈধকরণের (Delegitimization) বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে, একাত্তর ইস্যুর সমাধান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে। প্রথমত, পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির ভূমিকা। তাদের ভূমিকা কেবল বাঙালিদের বিরুদ্ধে ছিল না; তারা বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবিদের দরিদ্র অংশ, পাঠান এবং পশতুনদেরও শোষণ করেছে। দ্বিতীয়ত, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা। এটি ভারতের জনহিতৈষী কোনো পদক্ষেপ ছিল না। ভারত ১৯৪৭ থেকেই পাকিস্তানকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে আসছে, কারণ পাকিস্তান ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি বড় বাধা ছিল। ভারত ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৬৫ সালে দুটি যুদ্ধ লড়েছে এবং দুটিই অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। ফলে ১৯৭১ ছিলো ভারতের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ। ইন্দিরা গান্ধী নিজেও একে "হাজার বছরের সুযোগ" হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ভারত চেয়েছিল পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে, আর আমরা চেয়েছিলাম পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্তি। এটি ছিল উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক।

সেক্যুলার এবং আওয়ামী লীগের এই বয়ান যে "১৯৭১-এ ভারতের সহায়তার জন্য আমাদের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত" এটিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। পাশাপাশি, জামায়াতে ইসলামেরও একাত্তর ইস্যুতে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তারা বলতে পারে, "আমরা রাজনৈতিক বুঝাপড়ার দিক থেকে সঠিক অবস্থানে ছিলাম। আমাদের উদ্বেগ ছিল স্বাধীনতা অর্জনের পর কিভাবে তা টিকিয়ে রাখব এবং কিভাবে ভারতের আধিপত্য মোকাবেলা করব। তবে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সমর্থন করা আমাদের ভুল ছিল। আমাদের উচিত ছিল পাকিস্তান আর্মির ক্ষমতার অপব্যবহার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।" এইভাবে, একাত্তরের ইস্যু থেকে এগিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে ইসলামের অবৈধকরণ রোধ করা সম্ভব হবে।

শাহবাগ:

শাহবাগ হচ্ছে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শেখ হাসিনার সমর্থনে ইসলামকে অবৈধকরণের প্রচেষ্টা। শাহবাগের মূল লক্ষ্য কেবল

জামায়াতের নেতারা ছিলেন না বরং এর লক্ষ্য ছিলো বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বয়ানের ভিত্তিতে সেক্যুলারিজমের চূড়ান্ত বিজয়। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছিলো শাপলা আন্দোলন। তারা বললো, আমাদের ইসলাম ধর্ম এবং আমাদের নবী (সা.)-কে অপমান সহ্য করা হবে না। ১১ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহবাগ পরাজিত হয়েছে আর শাপলা জয়ী হয়েছে। শাহবাগ হয়তো জামাতের কয়েকজন নেতার ফাঁসি নিশ্চিত করতে পেরেছে কিন্তু তাদের যে মূল লক্ষ্য- বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক করা এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিজয়- সেক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছে। ৭১-এর রাজাকারের বর্ণনাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এটাই শাপলার বিজয়। শেখ হাসিনার বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রমাণ করে, রাজনৈতিক এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন।

তানজীন দোহা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ইসলাম প্রশ্ন:

প্রথমত আমি শুরু করতে চাই, বাংলাদেশে আমাদের অন্যতম বড় সংকট হলো ইতিহাস, রাজনৈতিক ঠিকুজি (political geneaology) ও রাষ্ট্র নির্মাণে ইসলাম প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে যাওয়া। আমাদের পতিত শাসক শুধুমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক শাসক না বরং আমি ক্যামেরুনিয়ান তাত্ত্বিক আশিলি এম্বেবের বরাতে বলবো□সেক্যুলার লাশতান্ত্রিক (Nacropolitical) সরকার যা উত্তর উপনিবেশী সময়ে লাশ বন্দোবস্ত করার প্রশ্নকে মোকাবেলা করে। ২০১৩ সালের শাপলা গণহত্যায় নিহতদের নিয়ে আমার কাজ। এ কাজের জন্য- এমনকি একজন গবেষক হয়েও গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি বা রাষ্ট্রের দমনযন্ত্র থেকে নিজেকে দূরে রাখা আমার জন্য কঠিন ছিলো। হাসিনা সরকারের কর্মকান্ডের মূলে ছিলো ওয়ার অন টেরর। তারা সাংবিধানিক ভিত্তির উপর লাশতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করেছে। তারা বিভিন্নভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে এবং পুরনো সংবিধানে ফিরে না যাওয়ার নীতিও তৈরি করেছে। এই সরকারকে সংবিধান ভিত্তিক লাশের রাজনীতি বা সংবিধান ভিত্তিক ফ্যাসিজম বলা যায়। এই কাঠামো ৭২ এর সংবিধানে ফিরে যায় যা রাজনীতিতে ইসলাম প্রশ্নকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। যখন ছাত্ররা স্লোগান হিসেবে □তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার□ ব্যবহার করে, তখন তারা পতিত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অবমাননাকর শব্দের প্রতিবাদ করে□যা তাদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। জঙ্গি, সন্ত্রাসী, রাজাকার শব্দের রেটোরিক্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ □উম্মাহ□ ধারণার বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক এই বিদ্রোহকে সত্যিকারার্থে বিপ্লবে পরিণত করতে হলে ইসলাম প্রশ্ন অমীমাংসার রাজনৈতিক ঠিকুজি নিয়ে সঠিকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এখন অনেকেই বাংলাদেশে □পোস্ট ইডিওলজি□, □পোস্ট ইসলামিজম□ শব্দগুলো ব্যবহার করছেন। এটা ইসলাম প্রশ্ন মীমাংসা থেকে দূরে থাকার একটা কৌশল। এটা মূল প্রশ্নকে উপেক্ষা করার কৌশল যে প্রশ্ন এই সম্পূর্ণ আন্দোলনকে উস্কে দিয়েছে।

অবশ্যই আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন ধারার অংশগ্রহণ ছিলো এতে কোনো সন্দেহ নাই। ইসলামী ভাবধারার অনেকেও এতে শামিল ছিলেন। মাদ্রাসা ছাত্ররাও এতে গভীরভাবে যুক্ত ছিলো। ২০১৩ সালে যখন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উপর গণহত্যা চালানো হয় তখন সরকার প্রথমে তা অস্বীকার করে এবং পরে গোপন করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি এবং মূলধারার রাজনীতিবিদরা গুরুত্বসহকারে এটি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়, কেননা বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি ওয়ার অন টেররের যুক্তি ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রশিক্ষিত। ইসলাম ও ইসলামী কর্তাস্বত্ত্বার অপনোদন হাসিনার তৈরিকৃত এই ধরনের হত্যাযন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয়।

বাংলাদেশের মধ্যে এখন যেভাবে পোস্ট ইসলামিজম শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা রাষ্ট্রপ্রশ্নে আবার ইসলাম প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে চাচ্ছে। যদি আমরা সত্ত্বাতাত্ত্বিক (Ontological) সেক্যুলারিজমের কথা বলি, এর অর্থ হলো আমি সত্ত্বাতাত্ত্বিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে এমন কাউকে শত্রু বিবেচনা করব, যারা পাকিস্তানের প্রতি কোনো ইতিবাচক ধারণা রাখে বা ইতিহাসের এমন কোনো ব্যাখ্যা পোষণ করে, যা একাত্তরের প্রচলিত বয়ানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং যা বিভিন্ন প্রপাগান্ডা মেকানিজম ও সাংস্কৃতিক উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। একইভাবে, যদি কেউ কোনো ইসলামী দলঘেষা হয়, তবে তাকেও শত্রু হিসেবে দেখা হবে। এটাই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী বয়ানে □রাজাকার□ শব্দের উপযোগিতা।

সবাই জানে ছাত্ররা এই শব্দকে কৌতুক হিসেবে নিয়েছে এবং তারা এই ধরণের বয়ান এবং রাষ্ট্রের শত্রু চিহ্নিতকরণকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা দেখেছি পাকিস্তানি ছাত্ররাও একই ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য যা সত্যিকার অর্থেই অভূতপূর্ব এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, এক ধরণের সেক্যুলারিটি সত্তাতাত্ত্বিক ভিত্তি (Ontological basis) থেকে নিয়ন্ত্রণমূলক ভিত্তির (disciplinary basis) দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে যা সেক্যুলার রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে যেখানে ইসলাম প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

> যখন পোস্ট ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন রেটোরিক ব্যবহার করা হয় তখন তা রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের প্রশ্নে ইসলামকে মূল প্রশ্ন হিসেবে চিহ্নিত করতে চায় না। এখানে ধারণাটা হলো, ইসলামিস্টদেরকে ইসলামের প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী বিভিন্ন বৈচিত্র্যে বিভক্ত করা। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা (ডিএসেন্সিয়ালাইজেশন অফ ইসলাম)। এটি মূলত কুরআন এবং হাদীসের কেন্দ্রীয়তা এবং ইসলামের সংজ্ঞা নির্ধারণকারী কাঠামোকে অপসারণ করে। এর পরিবর্তে, ইসলামের অন্য কোনো রূপে ফোকাস করা এবং ইসলামের বিভিন্ন রুপ আছে ইত্যাদি বলা হয় যার ধারণা আমরা সাহাব আহমেদ থেকে পাই। এই ধরণের চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা কর্তাসত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণমুলক পদ্ধতি।

আশার দিক হচ্ছে, অনেকেই আয়নাঘর থেকেই মুক্ত হয়েছেন। ইসলামিক বিভিন্ন গোষ্ঠীও পরিবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী। তারা খুশী কারণ হাসিনা আর ক্ষমতায় নেই। যেমন আমিও খুশী, কারণ এখন চাইলে দেশে গিয়ে কোনো গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারী ছাড়াই গবেষণা করতে পারবো। বিশেষ করে জামাতে ইসলাম যেভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন মোকাবেলা করেছে তা আশাব্যঞ্জক এবং ক্ষমতা পরিবর্তনে তারা সহায়তা করেছে। এটা ভালো লক্ষণ। তবে বিএনপি ২০০১ সালে জামাতের সাথে একত্রে কাজ করেছে বাইরের হস্তক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত। তখন তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভূতপূর্বভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলো। কিন্তু এখন দুই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিএনপি জামাতের ব্যাপারে সমালোচনামূলক মন্তব্য করছে যা আশঙ্কাজনক। কেননা হাসিনা চলে যেতে পারে কিন্তু ভারত এখনো বাংলাদেশে তার স্বার্থ নিয়ে আগ্রহী। এই বিপ্লব ভারতীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা এবং আধিপত্যবাদী ভারতীয় আগ্রাসনের গালে চপেটাঘাত। তারমানে এই নয় যে, তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করবে। তারা ব্যাগ গুছিয়ে চলে যাবেনা। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনো অনেক র এজেন্ট রয়েছে যারা সমস্ত জায়গায় অনুপ্রবেশ করেছে। এজন্য তারা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলের রেটোরিককে প্রভাবিত করতে পারছে। এমনকি এখনো বিএনপি একাত্তরের বয়ান ব্যবহার করে জামাতের সমালোচনা করছে, যে বয়ান অতীতে হাসিনা স্বয়ং ব্যবহার করতেন। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু তারা কেন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ভালগার সেক্যুলারিজমের রেটোরিক ব্যবহার করছে ইসলামী ধারাগুলো বিপরীতে। এসবই এমন কিছু বিষয় যা আমি সামনে আনতে চেয়েছি। রাষ্ট্রের জন্য ইসলামের প্রশ্ন মীমাংসা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশ ইসলামের চেতনা বহন করে। রাষ্ট্রকে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যদি রাষ্ট্র ও সংবিধান ইসলামের প্রতিফলন না ঘটায় এবং নতুন শাসন ব্যবস্থা কেবল রেটোরিক্যাল ভাষা ব্যবহার করে এই প্রতিফলন এড়িয়ে যায়, তাহলে আমাদের মধ্যে নতুন উদ্বেগ তৈরি হবে।

এখন মূলত পর্যবেক্ষণের সময়। নতুন রাষ্ট্র সংস্কার কিভাবে হবে তা এখনো অজানা। এমন অনেক প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলোর মোকাবিলায় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া কতটুকু প্রভাবিত হবে, সেটাও অনিশ্চিত। আমরা ইতিবাচকভাবেই ব্যাপারগুলো পর্যবেক্ষণ করছি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নিতেসর দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্দেহপ্রবণ হতে হবে (hermeneutics of suspicion) - বিশেষ করে কিভাবে নতুন বয়ান তৈরি হচ্ছে।

বিপ্লব হচ্ছে, সিস্টেমের পরিবর্তনের পাশাপাশি জনগণের রাজনৈতিক এবং নৈতিক চেতনার প্রতিফলন রাষ্ট্রে ঘটতে হয়। যদি এই প্রতিফলন না ঘটে, তাহলে রাষ্ট্র জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে না। রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব বিদ্যমান। এর মধ্যে একটা ধারণা হচ্ছে মানুষ যখন পরিবারের মধ্যে থাকে তখন তাদের চেতনা অনুভূতি ও মনোভাবের পর্যায়ে থাকে। মানুষ যখন সমাজে থাকে তখন তাদের চেতনা আন্তঃব্যক্তিয় স্বতন্ত্র পর্যায়ে (Interpersonal Individula level) থাকে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছালে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের চেতনার বহিঃপ্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, হাসিনা মানুষের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যের গভীর সংযোগ রয়েছে, এর বিপরীতে ইসলামী চেতনা বিকশিত হয়েছে, যা উপেক্ষা করা অসম্ভব।

বর্তমানে যে সংবিধান বিদ্যমান এটিকে বাতিল করা প্রয়োজন। জাতীয় সমঝোতা তৈরি করা প্রয়োজন যা ১৯৭৫ সালে ইতোমধ্যে হয়েছে। জাতীয় সমঝোতা বলতে কী বোঝায় আমাদেরকে তা অনুধাবন করতে হবে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও ভারতীয়দের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। অন্য যেসব দল সংগ্রামে নিযুক্ত, তাদের জন্য নতুন রাজনীতি গড়ে তুলতে একটি সুষ্ঠু সমঝোতা প্রক্রিয়া আবশ্যক। সেক্যুলারিজমের প্রশ্ন আমার নিজস্ব কোনো চিন্তা না। তবে ইসলাম সংক্রান্ত প্রশ্নের সাথে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামবিদ্বেষী সেক্যুলার ধারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংঘর্ষ এবং শত্রুতা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যমান। এই জাতি পাকিস্তান ধারণা থেকে বের হয়ে প্রথম থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধী হিসেবে তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপারে আমাদেরকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। ২০২৪ সালে সিভিল সোসাইটি ক্রমাগত বলে যাচ্ছে এটি আরেকটি একাত্তর।

শাপলা:

চব্বিশে শাপলার স্পিরিট বিদ্যমান। শাপলায় যেভাবে লক্ষাধিক মাদ্রাসা ছাত্র-উলামারা রাসুলের ভালোবাসায় বের হয়ে এসেছে তা কোনোভাবেই রাষ্ট্রে উপেক্ষিত হতে পারে না। শাপলা গণহত্যা বা প্রথম দিককার সংগ্রাম যা ইসলামের স্পিরিট বহন করে তা ব্যতীত বাংলাদেশ তাঁর সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেবনা। বিষয়টি সবসময় আমাদের জন্য একটা সমস্যা হিসেবেই রয়ে যাবে। তাই ইতিহাসের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে আমাদের নিজেদেরকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। ইসলাম প্রশ্ন এবং জাতীয় সমঝোতার মাধ্যমে কিভাবে একটি ইসলামবান্ধব রাষ্ট্র গঠিত হবে যা ইসলামের স্পিরিট বহন করবে তা আমাদের চিন্তা করতে হবে।

ভারতীয় আধিপত্যবাদ:

নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার দিক থেকে রাষ্ট্রকে ভারতবিরোধী করতে পারাটাই বাংলাদেশের লড়াই। এই লড়াই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। এই সময়ে আমাদেরকে অন্যান্য প্রতিবেশি দেশগুলোর ব্যাপারেও ভাবতে হবে যারা এই প্রক্রিয়ায় আমাদের সহায়তা করতে পারে। এ জায়গা থেকে পাকিস্তান আমাদের স্বাভাবিক মিত্রতে পরিণত হবে। তাই আমাদেরকে তাই আমাদের শুধুমাত্র ইতিহাসের নেতিবাচক দিকগুলো যেমন পাকিস্তানের সামরিক শাসনের কথা ভাবলেই চলবে না; বরং ১৯৪৭ সালে এই দেশের বাঙালি ও কৃষকরা যে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সমর্থন করেছিল, সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে ইতিহাসকে তুলে ধরবে, এবং আমাদেরকে সেই ইতিহাসের স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় মীমাংসার পথে হাটতে হবে। এজন্য আমাদের ইতিহাস পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

শেষ মন্তব্য:

আমি মনে করি, প্রশ্নটা হলো, কীভাবে আমরা নিশ্চিত করবো যে এটি একটি বিপ্লব? কীভাবে আমরা নিশ্চিত করবো যে ভারতীয় গোয়েন্দা, ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা আমাদের জীবনকে ব্যাহত করবে না এবং আমাদের সার্বভৌমত্ব ফিরে আসবে। এজন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে এবং এর জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। আমাদের সবারই এতে বিভিন্ন ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। আবু সাঈদ শহীদ হওয়ার পর, যখন হ্যাকাররা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাক করেছিল, তারা লিখেছিল, "এটা এখন যুদ্ধ"। আমি বলতে চাই, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, এবং বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের আগ্রহ এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

সূত্র: Bangladesh□s Revolution: Challenges, Opportunities and the Umma

মাহমুদুর রহমান

সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ। জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী উপদেষ্টা।